অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চাঁদের তাঁবু
শিশু সাহিত্য সংসদ

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চাঁদের তাঁবু
শিশু সাহিত্য সংসদ

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শিশু সাহিত্য সংসদ

CHANDER TANBU
(A novella for Children)
by Amarendra Chakraborty

ISBN : 978-93-88770-04-0

© লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : ধ্রুব এষ
প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৯

প্রকাশক : দেবজ্যোতি দত্ত শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
মুদ্রক : এস.পি. কম্যুনিকেশন প্রা. লি., মারলিন মেরিগোল্ড, ৩১বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

জনপদের কবি ও কথক
শ্রীঅমর মিত্র
প্রীতিভাজনেষু

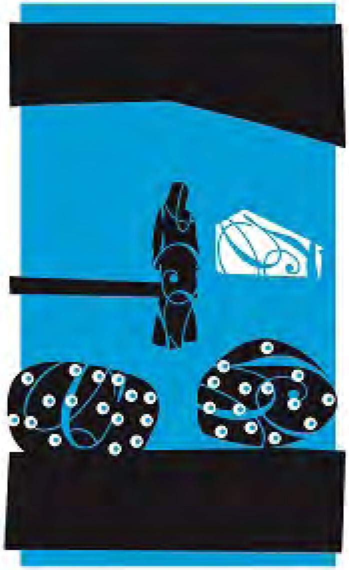

সূচি

চাঁদের তাঁবু

চাঁদের তাঁবু

মায়ের কাছে শুনেছি আমার যখন দু-বছর বয়েস, দাদার দশ, তখন আমাদের বাবা একদিন মেদিনীপুর থেকে অনেক দূরে কাশ্মীর বলে একটা পাহাড় ঘেরা রাজ্য আছে, সেখানে যুদ্ধে গেলেন আর ফিরলেন না।

ফিরল খুব লম্বা একটা মুখবন্ধ কাঠের বাক্স। পাড়ার সবাই বলল, এটাই আমাদের বাবা।

দাদার কাছে শুনেছি আমার যখন সাত বছর বয়েস, দাদার পনেরো, তখন একদিন মা পৌষ-সংক্রান্তিতে কনকনে ঠান্ডায় গঙ্গাসাগরে ডুব দেবার জন্য সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না।

মায়ের সঙ্গীরা ফিরে এসে সবাই একমুখে বলল, মা নাকি সাগরে ডুব দিতে গিয়ে জোয়ারে ভেসে স্বর্গে চলে গেছেন।

এরপরও অনেক কাল বর্ষার দিনে বুক-কাঁপানো বাজের শব্দে আগের মতোই আমি ভয়ে চমকে উঠে যেন মাকে জাপটে ধরতে গেছি!

বিদ্যুতের চোখ-ধাঁধানো আলো আর তার ঠিক পরই পুরো শরীর ঝাঁকিয়ে বাজ পড়ার শব্দ থেকে বাঁচাতে মা-ই দৌড়ে এসে আমাকে বুকে চেপে ধরতেন।

আমার এখন তেরো বছর, দাদার একুশ, একদিন দাদা এসে বলল, 'আমেরিকা যাবি?'

'আমেরিকা? সেই যেখানে খুব বরফের ঝড় হয়? বন্যায় শহর ডুবে যায়?'

'দূর, সে কি সারা বছর হয় নাকি? সারা দেশে হয় নাকি? কখনো হয়তো কোনো একটা অঞ্চলে এমন হয়ে থাকে।'

'বরফের ঝড়ে আমরা যদি শীতে কাঁপতে কাঁপতে উড়ে যাই!'

'বরফের ঝড় না রে পাগলা, বরফকুচির ঝড়। তুষারঝড় বলাই ঠিক। এবছরও কোথায় যেন তুষারঝড়ে ঘরবাড়ি গাড়িঘোড়া চাপা পড়বার জোগাড় হয়েছিল।'

দাদা আমেরিকায় বিনা পয়সায় কী একটা বিষয়ে অনেক অনেক পড়াশোনার বৃত্তি পেয়েছে, ক-দিন ধরে দেখছি প্রায়ই গুনগুন করে গান গায়। একদিন দুপুর রোদে ঘেমে বাড়ি ফিরে, আমাকে দেখেই পিঠে দুম করে একটা কিল মেরে বলল, 'কলকাতা থেকে দুবাই, দুবাই থেকে সোজা নিউ ইয়র্ক। তার মধ্যে দুবাইয়ে মরুভূমিতে সন্ধ্যে বেলা আরব দেশের গানবাজনার সঙ্গে এলাহি ডিনার। একদম ফ্রি! সবটাই বিমান কোম্পানির ব্যবস্থা।'

পিঠে কিল খেয়ে আমার দম প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল, তবু জানতে চাইলাম, 'তা কী করে হবে?'

'আমরা যাতে আর কোনো বিমানে না গিয়ে এদের বিমানেই যাই, তাই এই ফ্রি ডিনার-টিনার। তোর মাথায় এসব ঢুকবে না।'

'দাদা মরুভূমিতে কি আমরা উটে চড়ে যাব?'

'আরে না না। ওরাই ওদের গাড়ি করে নিয়ে যাবে, আবার রাতের মতো হোটেলে ফিরিয়েও আনবে।'

'উট ছাড়া মরুভূমিতে যাওয়া যায় নাকি?'

'তোকে ওসব ভাবতে হবে না। তুই বরং চট করে খেয়ে নিয়ে একটু আগে আগে ঘুমিয়ে পড় তো। কাল আবার রাত-টাত জাগতে হতে পারে হয়তো।'

সারা রাত আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে উড়তে উড়তে একবারও না ঘুমিয়ে ভোর বেলা নামলাম মরুভূমির দেশে। এয়ারপোর্টে প্লেন থেমে যাবার পরও দাদার নাক ডেকেই চলেছে।

সেদিন সন্ধ্যে বেলা হোটেলের এয়ারকন্ডিশন্ড ছোটো একটা বাসে মরুভূমির মধ্যে আমাদের নিয়ে খানিক এগোতেই পিছনের ঘরবাড়ি সব দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। যেদিকে যত দূর চোখ যায়, শুধু বালি আর বালি। আরও এগিয়ে হঠাৎই থেমে গিয়ে বাসটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে লাগল। সামনের দু-চাকাই নাকি বালিতে ডেবে গেছে। বাসটা একটুখানি পিছিয়ে এসে খুব জোরে বালির গাড্ডা থেকে যত বার উঠতে যাচ্ছে, তত বারই শুধু বিকট গোঁ গোঁ শব্দ। এক ফুটও এগোতে পারছে না।

ড্রাইভার ও তার সহকারী বাদে বাসে যাত্রী বলতে, আমি, আমার দাদা আর তিনজন জাপানি দিদি। চাকার গোঁ গোঁ শুনতে শুনতে হঠাৎ বাজ পড়ার মতো ড্রাইভারদের গলা কানে যেতে সকলেই চমকে উঠেছে। বোঝা গেল দু-জনে প্রচণ্ড ঝগড়া করছে। ভাষা জানি না বলে কী নিয়ে ঝগড়া ঠিক বুঝতে পারছি না। শেষমেশ ওরা আমাদের সকলকে বাস থেকে নামিয়ে হাঁটিয়ে মরুভূমির আরও ভেতরের দিকে নিয়ে চলল।

বাইরে আসতেই আগুনের প্রচণ্ড তাপ যেন আমাদের গায়ে মুখে আছড়ে পড়ল। আকাশ থমথমে। আমাদের দু-পাশ দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পোশাকে ঢাকা কয়েকজন লোক আমাদের পার হয়ে বালির ওপর দিয়ে হনহন করে দূরের দিকে চলে গেল। তাদের পায়ের ধাক্কায় বালি ছিটকে ছিটকে উঠছে। ড্রাইভারের তাড়ায় আমরাও পা চালিয়ে হাঁটার চেষ্টা করছি। একে তো গরমে পুড়ছি, তার ওপর বালিতে হাঁটা!

'এরা কোথায় নিয়ে চলল রে! সামনে না এগিয়ে যদি ফেরার পথ ধরত তাহলে হয়তো একসময় হোটেলে ফিরে যেতে পারতাম!'

দাদার গলার গুনগুন বাসেও বার কতক শুনেছি, এখন ভয় মেশানো গলা শুনে আমিও ভয় পেয়ে গেলাম। কেউ কারও ভাষা বুঝি না বলে ভয় যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আরবি, জাপানি আর বাংলা- হায়, কোনো ভাষার সঙ্গে কোনো ভাষারই মিল নেই!

দাদা ইংরেজিতে নানা ভাবে চেষ্টা করেও কিছু বুঝতে বা বোঝাতে পারল না।

জাপানি দিদিরা শুধু খুব টেনে টেনে গলা দিয়ে হাউমাউ-জাতীয় শব্দ করে কিছু বোঝাতে চাইছে, আর আরবি দু-জন অন্যদের সমস্যায় পড়তে দেখেও বোবা কালা ও অন্ধ সেজে আছে।

পিছন থেকে 'হঠ যাও' 'হঠ যাও'-য়ের মতো আওয়াজ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি একটা লোক একটা বাচ্চা উটকে গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গায়ের জোরে উড়ু-উড়ু বালির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল। দূর থেকে দেখলাম উট বালিতে প্রত্যেক বার পা তোলবার আগে খুর সেঁটে রাখবার চেষ্টা করেও পারছে না।

পিছন থেকে এসে একসঙ্গে কয়েকজন করে লোকের হনহনিয়ে আমাদের পার হয়ে চলে যাওয়া বেড়েই চলল। সব দলেই নানা বয়েসের মানুষ। বোরখা পরা মহিলাও আছে।

হাওয়ার জোর ক্রমেই বাড়ছে। এক-একবার হাওয়া উঠে বালির পাতলা চাদর উড়িয়ে নিয়ে কাছেই বিছিয়ে দিচ্ছে। আমাদের মেদিনীপুরের বড়াইখালে জেলেদের হাতজাল ছোড়ার মতো এই বালির পাতলা চাদর আছড়ে পড়া দেখে তখনও বুঝিনি কী সাংঘাতিক ঝড় আসছে। হাঁটা তো দূরের কথা, চোখ-মুখে হাজার হাজার ছুঁচ ফোঁটার যন্ত্রণাই অসহ্য হয়ে উঠল। বাতাস যেন আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে! দাদা আমার সামনে এসে আমার একটা হাত শক্ত করে ধরতেই আমিও গায়ের জোরে দাদার হাত ধরে থাকলাম।

বাসের কাউকেই কোথাও দেখা যাচ্ছে না। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

মরুভূমির সাংঘাতিক ঝড়ে দু-জনে দু-জনকে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। এগোবার বা পেছোবার কথা ভাবতেও পারছি না।

হাওয়া যেন রাগে গর্জন করতে করতে আমাদের ধাক্কা মারতে লাগল। একসময় হাওয়ার বিরাট একটা ঝাপটায় ছিটকে গিয়ে কে কোথায় উড়ে গেলাম।

চোখ খুলে দেখার উপায় নেই, সারা মুখে ঝাঁক ঝাঁক ছুঁচ ফুটছে, নাক দিয়ে শ্বাস টানাও অসম্ভব। হাওয়ার কিল-ঘুসি থেকে বাঁচবার শেষ চেষ্টায় দু-হাতে কান-চোখ ঢেকে উটের মতোই হাঁটু গেড়ে উট পাখির মতো বালিতে মাথা গুঁজে ভাবতে লাগলাম দাদাকে কোথায় পাব?

অনেক পরে দাদা দু-কাঁধ ধরে আমাকে উঠিয়ে বলল, 'একটু পা চালিয়ে চলো, রাত শেষ হবার আগেই আমাদের কুয়োর কাছে পৌঁছোতে হবে।' বিপদে পড়লে দাদা আমাকে 'তুমি' বলে। গলার স্বর ভয়ে যেন বদলে গেছে।

এমন স্বর শুনেই অবাক হয়েছিলাম, চোখ খুলে দেখলাম কোথায় আমার দাদা, এ তো সাদা পোশাকে পা অবধি ঢাকা শীর্ণ চেহারার একটা লোক। ধপধপে সাদা চুল-দাড়ির ফাঁক দিয়ে মুখের যেটুকু দেখা যাচ্ছে- কুচকুচে কালো লোকটা আমার হাত ধরে আছে। কুয়োর কথা শোনামাত্র তৃষ্ণায় আমার মুখের তেতো ভাব বেড়ে গেল, গলা অনেকক্ষণ থেকেই শুকিয়ে কাঠ।

লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে ভরসা পেলাম, জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার দাদা কোথায়? দাদা হয়তো কাছেই কোথাও পড়ে আছে!'

'এখানে তুমি একাই ছিলে। আর কেউ নেই। এখন চলো, আগে কুয়োর কাছে যেতে হবে।'

লোকটার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতেই বললাম, 'কুয়োয় জল আছে?'

'কুয়ো ভরা জল। জল না বলে উটের দুধও বলতে পারো।'

কথা বলতে কষ্ট হয়, তবু না বলে পারলাম না, 'উটের দুধ? কুয়োর মধ্যে? সে কীরকম?'

'পরে শুনলেও চলবে। এ হল সেই পৌরাণিক যুগের কুয়ো। যখন এখানে ঘন জঙ্গল ছিল। এখন পা চালাও। সূর্য ওঠার আগেই তোমাকে পৌঁছোতে হবে।'

'সূর্য উঠে গেলে কি জল গরম হয়ে যাবে?'

লোকটা বোধ হয় মনের উদ্বেগ চেপে কথা বলল, 'সে কথা নয়। এ জল সব সময়ই ঠান্ডা। কিন্তু রাক্ষসী পাখি এসে গেলে আর কেউ কুয়োর ধারে-কাছে যেতে পারে না। গেলে রাক্ষসী পাখি তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে

হাজার টুকরো করে বালিতে ছড়িয়ে দেবে। বালিতেই তা ঢাকা পড়ে যায়। ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ওই রাক্ষসী পাখি বালির ঢেউয়ে শরীর পেতে কুয়োর পাড়ে গলা উঁচিয়ে দুই ডানায় মরুভূমি ঢেকে ঝিমোয় আর প্রহরে প্রহরে শুধু জল খায়।'

ঝড় থেমে গেছে। চারদিক শান্ত, কোথাও কোনোরকম শব্দ নেই। মাঝে মাঝে ঠান্ডায় গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে গতি হয়তো একটু কমে এসেছিল, লোকটা আমার হাত টেনে ধরে বলল, 'ছুটতে পারবে?'

'জোরে হাঁটার চেষ্টা করছি। দেরি হলে কি জল নীচে নেমে যাবে?'

'সূর্য উঠে গেলে আর সেখানে যাওয়া যাবে না। সারা রাত ধরে চেনা-অচেনা জন্তুর দল জলের জন্য কুয়োর চারপাশে ভিড় করে, তারাও এতক্ষণে হয়তো পালাতে শুরু করেছে। দূর থেকে রাক্ষসী পাখির ডানার দেখা পাওয়া বা ডানার আওয়াজ শোনার আগেই তারা জল খাওয়া শেষ করে, বা না করে দৌড় লাগাবে।'

ভাগ্য ভালো, পাখিটা আসবার আগেই আমরা উঁচু-নীচু বালির ঢেউ পেরিয়ে কুয়োর কাছে পৌঁছে গেলাম। চারদিকে বহু দূর পর্যন্ত বালির টিলায় ঘেরা পাথরের কুয়ো। মরুভূমিতে জল থাকে না অথচ এই কুয়ো ভরা জল। লোকটা ঠিকই বলেছিল, জল-মেশানো দুধের মতো পাতলা টলটলে।

তখনও কুয়ো ঘিরে কুকুর বা শেয়ালের মতো দেখতে জন্তুর পালের পাতলা ভিড়। তার মধ্যেই কুয়োর পাড়ে বাঁ-হাতে ভর দিয়ে মুখ নামিয়ে আমি যতক্ষণ পারলাম ডান হাতের আঁজলা ভরে জল খেলাম। বুড়োটা কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে হাড়ের তৈরি দেড়-দু-ফুট লম্বা একটা নল বের করে একটুও না ঝুঁকে সেই নল দিয়ে কুয়ো থেকে জল খেল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে ঢোলা জোব্বার হাতায় মুখ মুছে নিয়ে বলল, 'উটের পায়ের হাড় থেকে বানানো এই নল আমাদের অনেক কাজে লাগে। আর এই কুয়োর জলকে আমরা মরুভূমির লোকেরা কেন উটের দুধ বলি জানো? শুধু হালকা সাদা রঙের জন্য নয়, মিঠে স্বাদের জন্যও। এমন মিঠে জল আর তুমি কোথায় পাবে!'

জল খাওয়া শেষ করে বালির একটা উঁচু স্তূপের ছায়ায় বসে দাদার কথা ভাবছি, ভাবছি এত বড়ো মরুভূমিতে দাদাকে কোথায় খুঁজব, তা ছাড়া দুবাইয়ে এক রাতের যাত্রাবিরতিতে হোটেলে ঘুমিয়ে নেবার যে

ব্যবস্থা ছিল, বালির বুকে রাতের ভোজের মতো সেটাও পণ্ড। এখন আমাদের আমেরিকা যাবারই বা কী হবে? ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। এখানে বসে বসে শুধুই সময় নষ্ট।

আমি উঠে দাঁড়াতেই লোকটা আমার হাত টেনে বসিয়ে দিল। আমাকে রাক্ষসী পাখি দেখাবে বলে বালির স্তূপের আড়াল থেকে সে কুয়োর ওপরের আকাশে চোখে রেখে বসে আছে।

প্রথমে দূর থেকে ডানা ঝাপটানোর শব্দ, তারপর বিরাট চেহারার পাখিটাকে দেখতে পেলাম। মরুভূমিতে বালির ঝড় তুলে যখন কুয়োর ওপরে এসে পৌঁছেছে তখন তার দুই ডানায় আকাশ অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে। পাখি এত বড়ো? দেখে ভয় লাগে। যেসব কুকুর বা শেয়াল-জাতীয় জন্তুর পাল ভিড় করে আমাদের আগে থেকেই জল খাচ্ছিল ততক্ষণে তারা সবাই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'ভয় পেয়ো না। নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। রাক্ষসী পাখিও তোমাকে চিনিয়ে দিলাম।' একথা বলে লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে যে দিকে পাখি তার উলটো দিকে চলে গেল।

৩

সকালে বালির স্তূপের ছায়া যেমন লম্বা শুয়ে পড়েছিল, সূর্যাস্তের আগে আবার তেমনই লম্বা ছায়া, এবার স্তূপের অন্যদিকে। দুঃখে, খিদেয়, ক্লান্তিতে দিশেহারা হয়ে বালির স্তূপের আড়ালে শুয়ে শুয়েই দিনটা কেটে গেল। সূর্য ডোবার সঙ্গে পাখিটা তার বাসায় ফিরে যাবে। তখন আবার পেট পুরে জল খেয়ে দাদার খোঁজে যতদূর যেতে হয় যাব।

দূরে সূর্য পুরোপুরি বালিতে মিশে যাবার আগে থেকেই পুব আকাশে গোল চাঁদ চোখে পড়ল। আমিও বালি থেকে উঠে যেদিকে চোখ যায় হাঁটতে লাগলাম।

হাঁটতে হাঁটতে রাত কত হল জানি না, হয়তো প্রায় শেষ হয়ে আসছে। অথবা পূর্ণিমার আলোয় মরুভূমিতে সেভাবে রাতের অন্ধকার নামেনি। একসময় দূরে একটা বিরাট তাঁবু দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোতে লাগলাম।

সাদা ধপধপে তাঁবুর পাশেই একটা কালো ঘোড়া। মস্ত বড়ো তাঁবুর ঠিক পিছনে বিরাট একটা গোল চাঁদ। প্রায় তাঁবুর মাথায় এসে বসেছে। এই চাঁদই আমি সন্ধ্যে নামার আগে প্রথমে পুব আকাশে দেখেছি।

'এখানে আসবে আমি জানতাম।' বলতে বলতে তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সেই বুড়ো লোকটা। কাল রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত যে আমার শুধুই উপকার করে গেছে।

মরুভূমির মধ্যে আশপাশে আর কোথাও এত বড়ো তাঁবু আমি দেখিনি। বিশেষ করে এত উঁচু তাঁবু। তাঁবুর মালিক নিজে কিন্তু খুব লম্বা নয়। এখানেও পা থেকে গলা পর্যন্ত সাদা পোশাকে ঢাকা শরীরের মুখটুকু শুধু বেরিয়ে আছে। সাদা চুলদাড়ির ফাঁকে সেই পালিশ করা কুচকুচে কালো কাঠের মতো মুখ।

এত বড়ো একটা তাঁবুতে লোকটার বাসা! খুব অবাক হয়েছি দেখে লোকটা আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলল, 'আমি মালিক নই, তাঁবুটা আসলে চাঁদের। পূর্ণিমায় চাঁদ সারা আকাশ ঘুরে শেষরাতে এই তাঁবুর পিছনে এসে বিশ্রাম করে। রোদ না ফোটা অবধি। তারপর নিজের জগতে চলে যায়।'

মালিক নয়, তাহলে ইনি কে? তাঁবুতেই বা কী করছেন?

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে আছি বুঝতে পেরে তিনি কাছে এসে আমাকে ডেকে নিলেন-'এত দূর এসেছ যখন, তাঁবুতে দু-দণ্ড বসে যাও।'

তাঁবুর ভেতরে পা দিয়ে দেখি মেঝেময় নুড়ি পাথরের ছড়াছড়ি। অনেকটা মুক্তোর মতো, তবে মুক্তোর চেয়ে বড়ো। অসংখ্য নুড়ি তাঁবুর এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ছড়ানো। অথচ তাঁবুর বাইরে আদিগন্ত শুধু বালি।

আকাশে তখনও সূর্যোদয়ের ছোঁয়া লাগেনি, এদিকে জ্যোৎস্নাও ফিকে হয়ে এসেছে, তাহলে চারদিক বন্ধ তাঁবুর ভেতরে এমন জ্যোৎস্নার মতো আলো কী করে হয়?

আমি খেজুর গাছের কাটা গুঁড়ির ওপর বসে এসব ভাবছি, লোকটা বড়ো একটা পাথরের গেলাস এগিয়ে দিয়ে বলল, 'খেয়ে তেষ্টা মেটাও। এ হল খরমুজার রস। যেমন ঠান্ডা তেমনই মিষ্টি।' সত্যিই তাই। কয়েক চুমুকে রস শেষ করে মরুপথের ক্লান্তি কেটে গেল।

আমার সামনেই আরেকটা খেজুর গাছের কাটা গুঁড়ি। ঘষে ঘষে মসৃণ করা। লোকটা তার ওপর এবার খেজুর পাতায় বোনা থালায় একগাদা খেজুর রেখে বলল, 'খাও। এমন মিষ্টি আর কোনো ফলে তুমি পাবে না।'

এ হল মরূদ্যানের বড়ো বড়ো খেজুর, মিষ্টি তো বটেই, তন্দুরি রুটির মাখা-আটার মতো নরম। দানাও বেশ সরু।

কালো মুখের হাসিও বড়ো মিষ্টি, তার ওপর যখন মাথা ঝুঁকিয়ে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল তখন তার প্রত্যেকটা কথাই মনে হল সত্যি।

লোকটা বলল, 'সারা রাত আকাশ ঘুরে এসে চাঁদ স্বয়ং এই তাঁবুতে বিশ্রাম করছে।'

অবিশ্বাস করব কী, আমি চমকে গিয়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালাম। লোকটার মতোই ফিসফিস করে বললাম, 'চাঁদ? এই তাঁবুর ভেতর? কই, দেখছি না তো!'

'চাঁদের মাপ জানো? এই তাঁবু তো ছাড়, গোটা মরুভূমিটার চেয়ে কোটি কোটি গুণ বড়ো। চাঁদ নামে পৃথিবীর এই উপগ্রহ দেখতে অনেকটা সোনার থালার মতো জানো নিশ্চয়ই? একটা থালাকে লক্ষ কোটি গুণ বড়ো করলেও চাঁদের মাপের তুমি নাগাল পাবে না। সেই চাঁদকে এত কাছে এসে দেখা যায় নাকি! আকাশে

যে চাঁদ দেখো, সেটা কোটি কোটি মাইল দূর থেকে দেখো বলেই দেখতে পাও। তাঁবুর ঠিক পিছনেই মস্ত বড়ো চাঁদ দেখোনি তুমি? তাঁবুর টানে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে।'

বিজ্ঞানের দিক থেকে কথাটা নিয়ে আমি ভাবছি দেখে লোকটা আবার বলল, 'তুমি তো এখন পৃথিবীতেই আছ, গোলাকার পৃথিবীটা কি তুমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ? পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূরের কোনো গ্রহ থেকে যদি পৃথিবীর দিকে তাকাও, আকাশে ঠিক চাঁদের মতোই পৃথিবীকেও দেখতে পাবে।'

কিছুই বুঝতে না পেরে বললাম, 'এই নুড়ি পাথরের মতো এখানে এগুলো কী?'

'সবই চাঁদের পাথর। চন্দ্রকান্তমণি। এই রত্নপাথর রোজই চাঁদের গা থেকে খসে পড়ে। চাঁদ নিজেই গা ঝাড়া দিয়ে এগুলো ঝরায়। কেন জানো?'

জিজ্ঞেস করেই লোকটা চুপ করে গেল। কারণটা জানি না তাই আমিও চুপ। একসময় ধীরে ধীরে লোকটা আবার মুখ খুলল-'এই মরুভূমিতে ভীষণ গরিব যত লোক আছে তাদের দেবার জন্য, যাতে দূর শহরে গিয়ে তারা এগুলো বেচে পেটের খিদে মেটাবার রুটি, আর রাতে শীতের কামড় থেকে বাঁচবার কম্বল জোটাতে পারে।'

কথা শেষ করে লোকটা এত জোরে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল যে সামনের দশ-বারো হাত বালিও যেন ছটফট করে উঠল।

'এতে যদি তারা খেতে-পরতে পায় তাহলে তোমার এই দীর্ঘশ্বাস কেন?'

লোকটা এ বারও একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'চাঁদই যদি না বাঁচে, তাহলে চাঁদের পাথর আর পাব কী করে?'

চাঁদের আবার মৃত্যু হয় নাকি? আমি এতই অবাক হয়ে গেলাম যে, চাঁদ কেন আর নাও বাঁচতে পারে বলে তার মনে হচ্ছে, তা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না।

লোকটা নিজের মনেই বলে চলল, 'চাঁদকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যাবে কি না কেউ জানে না। পৃথিবীটাই বা কত দিন বাঁচবে! চাঁদ-পৃথিবীর ওপর রাক্ষসদের লোভ তো আজকের নয়, সেই প্রাচীন কাল থেকে।'

এ হয়তো কোনো পৌরাণিক কাহিনির কথা। আমার ক্লান্ত মাথায় ঢুকবে না। শেষ অবধি মানুষটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে দেখি, চাঁদ তাঁবুর মাথায় বসে আছে। এত কাছ থেকে এমন বিরাট চাঁদ কোথাও আমি দেখিনি।

পৃথিবীর যেখানেই যাও সেখানেই চাঁদ দেখা যায়। মনে হবে তোমার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে। অথচ দাদা এই মরুভূমিরই কোথাও হারিয়ে আছে, আমার সঙ্গে দেখাই হচ্ছে না।

চাঁদ আকাশ থেকে সবাইকে দেখতে পায়, আমার দাদাকেও দেখতে পাচ্ছে, তবু আমি দাদাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

উদ্ভট সব চিন্তা করতে করতে যেদিকে পারি সেদিকে চলেছি, মরুভূমিও সকালের রোদে গরম হতে শুরু করেছে।

এর মধ্যে কয়েক জায়গায় মরীচিকা দেখেছি। দূর থেকে মনে হয় সামনেই খাল বা হ্রদ। কোথাও দিঘির জল চিকচিক করছে। যতই কাছে যাই, জল ততই দূরে সরে যায়।

অনেক দূরে একটা তাল-খেজুর গাছের জটলার মতো দেখে মনে হল এও বুঝি মরুভূমির কোনো মরীচিকা।

আরও এগিয়ে চোখে পড়ল কয়েকটা খেজুর গাছ। রঙিন ফুলে রাঙা ঝোপও চোখে পড়ল। কাছেই কয়েকটা ঘরবাড়িও দেখা যাচ্ছে। মনে হয় কোনো গ্রাম। কিন্তু এ কখনো সম্ভব? ধুধু মরুভূমিতে প্রচণ্ড রোদে নিশ্চয়ই আমি জেগে স্বপ্ন দেখছি।

আরও কাছে গিয়ে বুঝলাম, স্বপ্ন নয়, রঙের মরীচিকা নয়, সত্যিই একটা আস্ত গ্রাম। ছোট্ট মরূদ্যান। কিন্তু মরূদ্যানের যেসব ছবি দেখেছি, তাতে কোথাও রঙিন ফুলের মেলা দেখেছি কি?

বোরখার মতো লম্বা ঢোলা পোশাক পরা একজন মহিলা ঘরের সামনেই একটা কুয়োয় বালতি নামাতে নামাতে অচেনা বিদেশি আমাকে আসতে দেখে আমার মুখের দিকে চেয়ে আমাকে বুঝতে চাইছে মনে হল। তার মুখ কিন্তু খোলা। আর বোরখার রংও কালো নয়, সাদা।

যখন কুয়োর সামনে এলাম, ততক্ষণে মহিলা কুয়ো থেকে জলভরা বালতি টেনে তুলেছে। চামড়ার বালতি। পুরু চামড়া, মোটা সুতোর মতো কিছু দিয়ে সেলাই করা। কুয়োর পাড় পাথরের চাঙর দিয়ে বাঁধানো।

ঘরের সামনেই আমাকে বসতে দিয়ে বড়ো খেজুর পাতার থালা-ভরতি খেজুর আর খরখরে ভারী পাথরের গ্লাসে জল এগিয়ে দিল। অদ্ভুত তৃপ্তিতে আর শান্তিতে আমার মন ভরে গেল। আমার ভয়, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা কয়েক মুহূর্তের জন্য মন থেকে মুছে গেছে। নরম মিষ্টি খেজুরে খিদে মিটিয়ে কুয়োর ঠান্ডা জলে তৃষ্ণা দূর করে ভাবছি আমি এদের কী দিতে পারি, এমন সময় ঘর থেকে আরেকজন মহিলা কোলে ছ-আট মাসের একটা ফুটফুটে ছেলে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। এখানকার মহিলারা সবাই দেখছি বোরখার মতোই ঢিলে-ঢালা পোশাক-পরা, তবে বোরখার রং সাদা, মুখেও ঢাকনা নেই। মহিলা আমার হাতের আঙুলের সোনার আংটি দেখিয়ে তার ছেলের জন্য চাইল। দুর্বোধ্য ভাষায় আকারে-ইঙ্গিতে বোঝাল, ছেলেটা আমার মতো বড়ো হয়ে এই আংটি পরবে, আর তা দেখে ওদের আমার কথা মনে পড়বে।

এই আংটি আমার উপনয়নের সময় দাদু আমাকে দিয়েছিলেন। আংটিটা খুলে ওই শিশুর হাতের মুঠোয় দিয়ে দিলাম। সে কিছু না বুঝেই গালভরা হাসি হাসল।

ঘরের পিছনেই দিগন্ত পর্যন্ত খোলা প্রান্তর। তার ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ভয়ানক চেহারার একটা লোক ঘরবাড়ি প্রায় আড়াল করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। জোরে একটা হাঁক পেড়ে আমাকেই বলল, 'ওরে মাল-বওয়া খোঁড়া উটের বাচ্চা! আমার হাঁটুর কাছে এসে দাঁড়া দেখি, দেখ তো তোর মাথা আমার হাঁটু ছাড়াতে পেরেছে কি না।'

লোকটার চোখ-মুখ সাংঘাতিক, তার চেয়ে সাংঘাতিক তার দেহের উচ্চতা। মাথা প্রায় আকাশে গিয়ে ঠেকছে। আর তেমনি পেশীবহুল চেহারা।

আমার মাথা লোকটার হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছোতেই পারেনি শুনে সে মহাখুশি হয়ে বলল, 'চাঁদ কি আমার চেয়েও উঁচুতে ঘুরে বেড়ায়?'

তার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, 'পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব হল তিন লক্ষ চুরাশি হাজার চারশো তিন কিলোমিটার।'

লোকটা আমার কথা বুঝল বা বিশ্বাস করল বলে মনে হল না। দূর থেকে চাঁদের তাঁবুর মালিককে আসতে দেখে বলল, 'ওই তো, ওর তাঁবুর মাথায় নাকি পূর্ণিমার চাঁদ নামে, ওকেই জিজ্ঞেস করব। তবে ও আবার আমার সঙ্গে কথাই বলতে চায় না। ওর ধারণা আমি নাকি রাতকানা, রাতের আকাশে চাঁদ দেখা আমার কম্ম নয়।'

তাঁবুর মালিক সোজা আমার কাছে এসে আমার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল, 'চলো, তোমাকে এই মরুরাজ্যের এক অদ্ভুত রাজার কাছে নিয়ে যাব।'

কথাটা শুনেই লম্বা লোকটা চিৎকারে চারপাশ কাঁপিয়ে বলল, 'কোথাও যেতে পারবে না! আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। মরুভূমির সবচেয়ে লম্বা মানুষের চেয়েও চাঁদ উঁচুতে থাকে কী করে?'

'তুমি রাতকানা বলে রাতে কি একেবারেই দেখতে পাও না?'

কথাটা কানে না তুলে লম্বা লোকটা এবার গর্জে উঠে বলল, 'আমার কথার জবাব দাও। পূর্ণিমার শেষ রাতে চাঁদ কি সত্যিই তোমার তাঁবুতে এসে জিরোয়?'

৪

আমার দাদা কোথায় কীভাবে আছে জানি না। তাকে কোথায় কোন দিকে খুঁজব?

লোকটার কাছ থেকে তাঁবুর মালিক ছাড়া পেতেই আমি বললাম, 'অদ্ভুত কোন রাজার কাছে নিয়ে যাবে বললে? সে কোন দিকে, কোথায়? সেখানে কি আমার দাদার দেখা পাব?'

'এখান থেকে তিন দিনের পথ। এদের কাছ থেকে ঠান্ডা জল আর এক থলে খেজুর সঙ্গে নিই।'

'জল কী করে নেবে?'

'কেন, ভিস্তিতে করে। চামড়ার এই ভিস্তি তুমি আগে দেখোনি?' বলে সে কুয়ো থেকে জল তুলে সঙ্গের ভিস্তিতে ভরতে লাগল। অনেকটা উটের পেটের মতো ধূসর রঙের চামড়ার ভিস্তি।

ভিস্তিতে জল ঢালতে ঢালতেই বলল, 'লম্বুটার ঘাড় একদিক বেঁকে আছে লক্ষ করেছ? শেষরাতের চাঁদ দেখার আশায় মাঝরাত থেকেই আকাশের অনেক উঁচুতে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর ঘাড়টা তাতেই বেঁকে গেছে। শেষ রাতে চাঁদ যখন তাঁবুর গায়ে, তখনও ও অনেক উঁচুতে চাঁদ খোঁজে।'

ঘাড় বাঁকা কি না আমার মনে পড়ল না, আমি শুধু ভাবছি তিন দিনের পথ মানে খুবই দীর্ঘ পথ। এতটা পথ যেতে যেতে কোথাও হয়তো দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

জলভরা ভিস্তি আর থলেভরা খেজুর নিয়ে লোকটা আমাকে নিয়ে রওনা হল। বেশ কিছুটা দূরে এসে বলল, 'যেখানে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি সেটা প্রাচীনকালের এক রাজার প্রাসাদ।' একটু থেমে আবার বলল, 'বড়োরা দেখবে সবসময় বড়ো বড়ো কিছু পেতে চায়, আবার সেজন্য অনেক আসল জিনিস তাদের হারাতেও হয়। সেই প্রাচীনকালেও এরকমই ছিল। তখনকার এমনই একটা ভয়ংকর ঘটনা তোমাকে দেখাতে

চাই। কেন জানো? সেই রাজাকে আমি যতবারই দেখি, দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়। সেই দুঃখ আমি কাউকে বোঝাতে পারি না। তুমি ঠিক বুঝবে।'

হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা করতে লাগল, তবু দাদার কোনো চিহ্নই কোথাও দেখা গেল না। শেষপর্যন্ত কথাটা তাঁবুর মালিককে না বলে পারলাম না। বালিতে আমাদের বাসের চাকা আটকে গিয়ে বালির ঢেউয়ে কী করে নেমে পড়তে হল, তারপর সাংঘাতিক মরুঝড়ে দু-ভাই কে কোথায় হারিয়ে গেলাম, যতটা পারি বুঝিয়ে বললাম।

তাঁবুওলা আমার সব কথা মন দিয়ে শুনল। তারপর বলল, 'মরুভূমিতে যেকোনো জিনিস অনেক দূর থেকেও দেখা যায়। আমি তোমাকে প্রথম যেখানে দেখেছিলাম সেখান থেকেই কি তোমাদের দু-জনের ছাড়াছাড়ি?'

'হাওয়ার ঝাপটায় আমি ওখানেই এসে মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম। বালির তোড়ে চোখ খুলে দেখবার সুযোগ পাইনি।'

শুনে লোকটা চিন্তায় ডুবে গেল। হাঁটতে হাঁটতে একবার শুধু দূর থেকে ঝাপসা মতো একটা উটপালককে দেখতে পেয়ে বলল, 'দাঁড়াও, যদি তোমাকে উটে চড়িয়ে বাকি পথটা নিয়ে যেতে পারি!'

উটপালক কাছে আসতেই তাঁবুর মালিক তাকে থামিয়ে নিজেদের ভাষায় কী বলাবলি করে আমাকে বলল, 'ওকে আর ওর উটকে এখনই পেট ভরে জল খেতে দিলে ও তোমাকে উটের পিঠে চড়িয়ে রাজার কাছে পৌঁছে দেবে।'

উট ও তার পালকের জলপান হয়ে গেলে উটটাকে হাঁটু গেড়ে বসানো হল, আমি যাতে সহজে পিঠে উঠতে পারি। কাছে গিয়ে চিনতে পারলাম এ তো সেই কয়েকদিন আগের দেখা লোকটা, যে একটা বাচ্চা উটকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

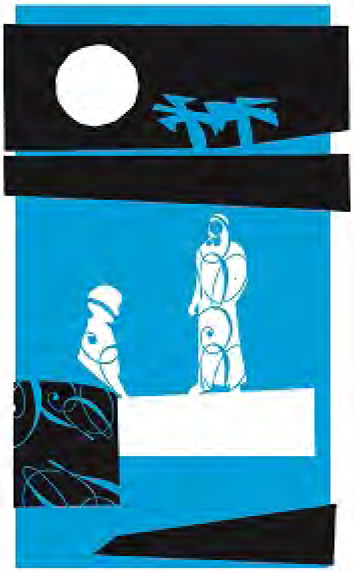

আমার উপকারী সঙ্গীকে সে কথা বললাম। জানালাম যে মরুঝড়ের ঠিক আগেই একে দেখেছিলাম। খুব নিষ্ঠুর লোক। এর উটে আমি চড়ব না।

আমার সঙ্গী বলল, 'উটের হাট থেকে সস্তায় উট কিনে কোরবানির জন্য বেশি দামে বেচে দেওয়াই ওর পেশা। উট পাঠায় মরুভূমির বাইরের দেশে।'

একসময় পশ্চিম আকাশ কমলা রঙে ছোপানো হচ্ছে দেখে বুঝলাম আজকের মতনও সূর্য ডুবে যাচ্ছে। সন্ধ্যে হবার আগে আমার সঙ্গী আমাকে একটা মস্ত উঁচু সোনালি প্রাসাদের লাগোয়া বড়ো পাথরের দেওয়ালের সামনে তিনটে মূর্তির কাছে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এই সেই মরুরাজ্যের যুদ্ধবাজ রাজা।'

মনে হয় রাজা-রানি আর রাজপুত্র ওঁরা। তিনজনেরই মাথায় মুকুট। রাজা-রানির সুন্দর চোখ থেকে আমার দৃষ্টি নেমে এল রাজপুত্রের চোখে। চোখের জায়গায় কালো দুটো গর্ত। জিজ্ঞেস করলাম, 'ছেলেটার চোখ নেই কেন?'

'রাজার মুকুটে গাঁথা নীল চোখের মণি তুমি দেখতে পাচ্ছ না?'

'মানুষের চোখ মুকুটে গাঁথা! রাজা হোক, যে-ই হোক, কারও চোখ অন্যের মুকুটে গাঁথা হবে কেন?'

কোনো উত্তর নেই। চোখ দেখে মনে হয় অনেক দূরের কিছুর মধ্যে সে হারিয়ে গেছে।

পশ্চিম থেকে একটা হালকা ঝড়ের হাওয়ায় উড়ে এসে পাতলা একটা বালির চাদর আমাদের সামনেই বালির বুকে ছড়িয়ে পড়ল। আঁকা ছবির মতো সেই স্থির বালির ঢেউ থেকে দৃষ্টি তুলে লোকটা বলল, 'অনেক কাল আগের কথা। এখানে একটা বিশাল রাজ্য ছিল। ডাইনে রাজপুত্র আর বাঁয়ে রানির মাঝখানে ইনিই সে-রাজ্যের রাজা। মরুরাজ্যকে পুবে-পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে বাড়িয়ে চলা ছিল তাঁর নেশা। চারদিকে ছোটো ছোটো রাজ্যগুলো ভয়ে ভয়ে থাকত। সাংঘাতিক হিংস্র দস্যুদলের মতো রাজা আজ কোন রাজ্যে হানা দেবেন, পালে পালে উট সেনা নিয়ে বালির ঝড়ে আকাশ ঢেকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তা ভেবে কাছে-দূরে অনেক দেশই উদ্বেগে দিন কাটাত! ছোটো ছোটো রাজ্যগুলোও সে যুগে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ মারামারি করে এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে এই রাজা অনায়াসে তাদের রাজ্য একটার পর একটা জয় করে নিতেন। মাইলের পর মাইল মরুভূমির বালিও তিনি রক্তে ভিজিয়ে দিতেন।'

আমার প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে বললাম, 'কিন্তু রাজার মুকুটে নীল চোখের মণি গাঁথা কেন?'

'এটা আসলে একটা হরিণের চোখ। এই মরুরাজ্য থেকে অনেক দূরে, একটা বনজঙ্গলের দেশ ছিল। দেশজুড়ে নীল জলের হ্রদ আর সবুজ তৃণভূমির ছড়াছড়ি। সেখানকার হরিণের চোখের মণি নীল। দেশেরও নাম তাই নীলচক্ষু হরিণের দেশ। সে দেশের কথা এখনও অনেকেই জানে। রাজকুমার একবার রাজার সঙ্গে সে-দেশে গিয়ে সেখানকার নীলচোখ হরিণের মায়ায় বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মরুরাজ্যের রাজা সে-দেশ জয় করে ফেরার সময় সুন্দর শিংওলা একটা হরিণ মেরে তার চোখের নীল মণি সঙ্গে নিয়ে এলেন। সেই নীল মণিই নিজের মুকুটে বসিয়েছেন। দেখে তো রাজকুমার রাগে-দুঃখে নিজের দু-চোখ উপড়ে ফেললেন। ছেলের চোখের গর্তের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রানিও অন্ধ হয়ে গেলেন, মারাও গেলেন কিছু দিনের মধ্যে।'

ইশ! কী মারাত্মক! রাজপুত্রের চোখ উপড়োনোর যন্ত্রণায় আমার নিজের চোখ কনকন করে উঠল। দু-হাতে চোখ ঢেকে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর বললাম, 'মুকুটে চোখ বসাবার জন্য একটা হরিণ মারলেন! আমাদের দেশের রাজা হর্ষবর্ধন মেলায় গিয়ে নিজের সব কিছু সবাইকে দান করে দেবার পর মণি-মুক্তো হিরে-জহরত বসানো গায়ের পোশাকও খুলে দিয়ে নিজে গামছা পরে প্রাসাদে ফিরতেন।'

মরুভূমিতে আমার এই প্রাণরক্ষক মানুষটি হাঁটা থামিয়ে বলল, 'তোমাদের রাজা এখনও বেঁচে আছেন?'

'না, না, এসব বারো-শো বছরের আগের কথা। আমাদের ইতিহাস বইয়ে আছে।'

'ইতিহাস বই কী?'

'ইতিহাস বই মানে যে-বইয়ে অতীত যুগের রাজা-রাজড়ার কথা লেখা থাকে, তাঁদের দেশ শাসনের কথা লেখা থাকে।'

'বই কী?'

'বই? যা পড়ে একজনের জ্ঞানের কথা সবাই জানতে পারে। এই পৃথিবীর কথা, এক-একটা দেশের কথা, এক-একটা যুগের কথা বই পড়ে জানা যায়। মানুষের ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, জীবনের পাপ-পুণ্য,

আনন্দ-বেদনা, সব তো বই পড়েই আমরা জানি। তুমি যে পৃথিবীর কথা বললে-কোটি কোটি মাইল দূর থেকে যাকে চাঁদের মতো দেখা যাবে, সে-ও তো বইয়েই লেখা থাকে। এসব কথা তুমি নিশ্চয়ই বই পড়েই জেনেছ।'

লোকটা এবার ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'না, না, আমি তো সবই দেখে শিখেছি। চাঁদ পৃথিবী সবই আমি দেখে শিখেছি। যারা লম্বুর মতো রাতকানা, কিংবা কী দেখতে কোন দিকে চোখ রাখতে হবে বোঝে না, তারাই ঠিকমতো দেখতে পায় না। বিরাট কিছুকে খুব কাছ থেকে পুরো দেখা যায় না, পুরোটা দেখতে হলে অনেক দূরে গিয়ে দেখতে হয়, বলেছিলাম না? এমন তো মরুভূমিতে আমরা রোজই দেখি।'

দু-জনে চুপ করে হাঁটছি, লোকটা হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'একদিন তুমি চলে যাবে ভেবে আমার চোখে এখনই কেন জল আসছে তা কি আমি জানি? তা কি তুমি জানো?'

একটু চুপ। তারপরই বড়ো একটা দীর্ঘশ্বাস। তারও পর বলল, 'মরুভূমির আকাশে আর বালিতে আমি অনেক খুঁজেছি, এ প্রশ্নের উত্তর আমি আজও জানতে পারিনি।'

আমি ভাবছি। এই মরুভূমি থেকে সত্যিই কি বেরতে পারব কোনোদিন? কে আমাকে বলে দেবে?

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সেই যে চুপ করল তারপর সারারাত আর একবারের জন্যও মুখ খোলেনি।

ভোর হবার আগে হাঁটতে হাঁটতে একসময় আমিই জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কথা বলছ না কেন? এত কম কথা বলে থাকো কী করে? আমাদের দেশে তো লোকেরা সব সময় কথা বলে!'

'অন্যকে বলবার মতো কথা বেশি খুঁজে পাই না। কথা বলি মনে মনে।'

'মনে মনে কী বলো?'

'কী জানি!'

'আমি তো দেখছি আমি কিছু জিজ্ঞেস না করলে তুমি কিছুই বলো না।'

একটু ভেবে নিয়ে লোকটা বলল, 'জিজ্ঞেস করলেও কি আর সব সময় বলতে পারি! এবার আরও জোরে পা চালাতে হবে। ভোরের আগেই তাঁবুতে ফেরা দরকার।'

'পূর্ণিমা তো এ মাসের মতো চলে গেছে, আজ তো চাঁদ নামবে না, তাহলে এত তাড়া কেন?'

এবার আর আমার কথার উত্তর না দিয়ে কী একটা ভেবে বলল, 'আচ্ছা, লোকে এত কথা বলে কেন?'

৫

তাঁবুর কাছাকাছি আসবার আগে, বেশ কিছুটা দূর থেকে তাঁবুর মাথা দেখা যায়। আরেকটু এগিয়ে তাঁবুর সামনে অনেক মানুষের ভিড় দেখে আমি আমার সঙ্গীর মুখের দিকে তাকালাম।

'পূর্ণিমার পরের ক-টা দিন চন্দ্রকান্তমণি নিতে ভোর বেলাতেই এমন গরিব মানুষের ভিড় হয়। একটু পা চালিয়ে, ভাই।'

ভোরের এই সময়টা এখানে রাতের মতোই ঠান্ডা। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের গায়ের ছেঁড়া চট বা কাপড়ের ফালি জড়ানো।

তাঁবুর ভেতরে জমাটবাঁধা বালির মেঝেয় তখনও অনেক পাথরকুচি ছড়ানো। এক কোণে পাথরকুচির স্তূপ থেকে হালকা জ্যোৎস্নার আভা বেরোচ্ছে।

সেদিনের মতো চাঁদের পাথর বিলানো শেষ হলে তাঁবুর মালিক আমাকে বলল, 'তুমি এখানেই জিরিয়ে নাও। এই খরমুজা আর খেজুর রইল, যত খুশি খেয়ো। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মরুভূমির তাপও বাড়বে। বেলা শেষে সূর্য কিছুটা শান্ত হলে আমি এসে তোমাকে ডাকব।'

যাবার আগে লোকটা তাঁবুর পাশের ঘোড়াটার কপালে হাত রেখে বিড়বিড় করে কিছু বলছে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এই ঘোড়াটা কি সত্যিকার ঘোড়া, না ঘোড়ার মূর্তি? প্রথম দিন যেভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, আজও সেই একভাবে দাঁড়িয়ে আছে।'

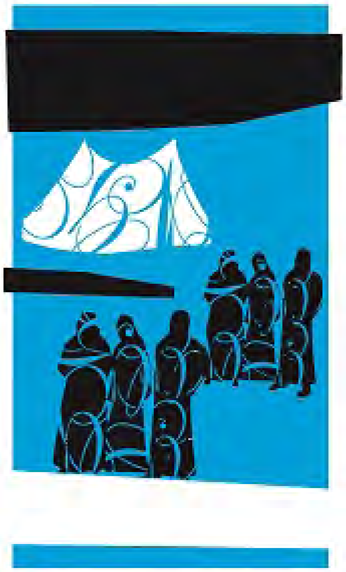

লোকটা ঘোড়ার কপালে হাত রেখেই কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমার ছেলের ঘোড়া।'

আবার খানিকক্ষণ চুপ। আমিও আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

একটু পরে লোকটা নিজেই বলে গেল, 'ছেলেটা যেমন ঘোড়াটাকে ভালোবাসত, ঘোড়াটাও তেমনই ছেলেটাকে। একদিন, কে জানে কীসের খোঁজে, ছেলে আমার কোথায় চলে গেল। দিন কেটে গেল, রাত কেটে গেল আর ফিরল না। মরুভূমির এদিক-সেদিক কতদিকে কত খুঁজলাম তাকে আর কোথাও পেলাম না।

'ঘোড়াটা এক জায়গায় একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। প্রথম প্রথম সারা দিন সারা রাত আকাশে মুখ তুলে চিহিঁহিঁ করে ছেলেটাকে খুব ডাকাডাকি করত। তারপর ক্রমশ চুপ হয়ে গেল। তাঁবুর যে দিকটায় আমার ছেলে রাতে ঘুমোত, সেই দিকে মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। দানাপানি সামনে দেখেও একবারের জন্য একটা দানা কি এক ফোঁটা পানি মুখে দিত না।

'একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই সে একদিন মারা গেল। ছেলের স্মৃতি তো রেখে দেবার মতো কিছুই নেই, তার ভালোবাসার ঘোড়াটার মূর্তিই তাই গড়ে রেখেছি। যদি কোনো দিন সে ফিরে আসে, তার ঘোড়াকে সে অবিকল আগের মতোই দেখতে পাবে।'

যাকে সাধারণ একটা ঘোড়া বলে ভেবেছিলাম, তারও যে এমন জীবনকাহিনি আছে না শুনলে জানাই হত না। যে মানুষটির দয়ায় আমি এখনও বেঁচে আছি তার মনেও কত দুঃখ, বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। সব শুনে আমি না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'ছেলে কেন ফিরে আসেনি বলে মনে হয়? কোথায় গেছে জানো?'

'মাঝে মাঝেই এরকম কীসের খোঁজে কোথায় চলে যায়। কোথায় যায় কেউ জানে না। দিনের শেষে আবার ফিরেও আসে। কখনো হয়তো ফিরতে দুয়েক দিন দেরি হয়েছে, কিন্তু ফিরেছে ঠিকই।'

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'এবার আর ফিরল না। রোজ ভোরে যারা চন্দ্রকান্তমণির টানে তাঁবুতে আসে, তাদের একজন একবার বলেছিল, ছেলেটাকে নাকি লুটের হাটে সে দেখেছে।'

মরুভূমিতে উটের হাট আগে শুনেছি, কিন্তু লুটের হাট কী? জিজ্ঞেস করতে লোকটা বলল, 'যেখানে লুটের জিনিস কেনাবেচা হয়। জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে মানুষকেও সেখানে বেচে দেয়। পরদেশিরা সেই লুটের হাটের বড়ো খদ্দের।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটু চুপ করে থেকে যোগ করল, 'যে গ্রামে তুমি গিয়েছিলে, সেখানকার সবুজ ঘাস আর রঙিন ফুল গাছ আমার ছেলের হাতে তৈরি। কখন কোথা থেকে কীসের বীজ এনে মরুভূমির বুকে কী উপায়ে ঘাস গজাল, ফুল ফোটাল, মুখ ফুটে কখনো কাউকে বলেনি।'

ওর ছেলে এসব করেছে শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তা দেখে লোকটা যোগ করল, 'ও যখন খুব ছোটো তখন একবার ওকে নিয়ে আমি একটা রঙিন ফুলের দেশে গিয়েছিলাম। সেখানে আকাশ ঢেকে ছোটো-বড়ো ফুলের গাছে শুধু রঙিন ফুল। সব দেখে আমার ছেলের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখানে ঘাস-ফুল সৃষ্টির ইচ্ছা তখনই ওর মনে বাসা বেঁধেছিল।

৬

এ ক-দিনে মরুভূমির কোন দিকে গেছি আর কোন দিকে যাওয়াই হয়নি, ভেবে কূলকিনারা পাই না। সবটাই যেন একটা ধাঁধা। অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারি না।

তাঁবুর মালিকের কাছ থেকে শেষ বারের মতো বিদায় নিয়ে যেদিন যেদিকে পারছি দাদাকে খুঁজে বেড়াই। মনে ভয়, দাদাকেও কেউ লুঠের হাটে বেচে দেয়নি তো! কোনো পথিক বা উটওলাকে দেখলে দাদার চেহারার বর্ণনা দিয়ে তাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকি। সকলেই দেখেছি বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে ভাবে, তারপর দু-দিকে মাথা নেড়ে জানায় যে, এমন কাউকে তারা দেখেনি।

দূর থেকে বেদুইনদের তাঁবু দেখলে জোরে পা চালিয়েও সেখানে পৌঁছোতে দু-তিন ঘণ্টা লেগে যায়। এভাবে কয়েকদিন শুধু বেদুইনদের এক তাঁবু থেকে আরেক তাঁবুতে খুঁজলাম-এরই কোনোটায় যদি দাদা আশ্রয় পেয়ে থাকে।

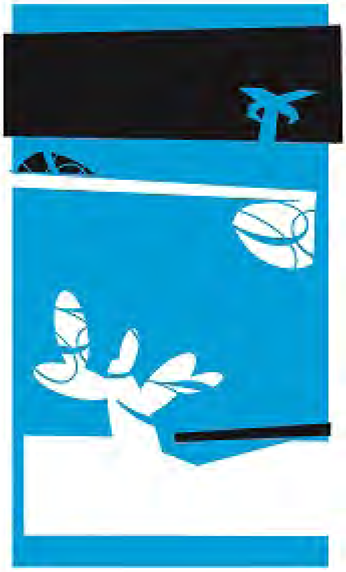

একদিন বহু দূরে তিনটে ছাতার মতো দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোতে লাগলাম। খানিকটা কাছাকাছি হতে বুঝলাম ছাতার মতো ওগুলো তাঁবু, আর সেই তাঁবুগুলো ঘিরে অনেক লোকের ভিড়।

মাঝের তাঁবুটার কাছে পৌঁছোতেই একটা ছেলে আমার দিকে এগিয়ে এসে ভালো করে আমাকে দেখতে লাগল। এরও লম্বা ঢিলেঢালা সাদা পোশাক। বয়েসে আমার চেয়ে পাঁচ-ছ বছরের বড়োই হবে।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর জিজ্ঞেস করল, 'কোন দেশের ছেলে তুমি?'

'ভারতের।'

'খুব বড়ো দেশ? আর অনেক নদী?'

'হ্যাঁ, সাগর থেকে হিমালয় পর্বত পর্যন্ত বড়ো। নদীও শত শত। গঙ্গা যমুনা নর্মদা কাবেরী ব্রহ্মপুত্র- আমাদের দেশের নদীর শেষ নেই।'

'তাহলে আমাদের মরুভূমিতে কেউ নদী আনতে পারল না কেন?'

'নদী কি ইচ্ছে করলেই আনা যায়! নদী তো জন্মায়। এই মরুভূমির দেশে তেমন হিমবাহ বা হ্রদ পাবে কোথায়?'

কথার মাঝখানেই ছেলেটা হঠাৎ তাঁবুর ভেতরে গিয়ে একটা আস্ত খরমুজ আর একটা ছুরি এনে আমাকে দিয়ে বলল, 'আগে এটা খেয়ে নাও।'

দরকারে পড়লে মানুষ করতে পারে না এমন কাজ নেই। আমারও তাই হল। বালির ওপর বিরাট আকারের খরমুজটা রেখে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খেয়ে একসঙ্গে তৃষ্ণা ও খিদে মিটল। খরমুজের চারপাশে কয়েক হাত বালি রসে ভিজে গেছে।

'বালির অনেক নীচেও এরকম জলে ভেজা বালি আছে। ডান দিকের তাঁবুর নীচেই তেমন আছে বলে আমার ধারণা। সেই ভেজা বালির নীচে নিশ্চয়ই জল আছে। তাই এখানেই আমরা কুয়ো খুঁড়ে চলেছি। তাঁবুর পিছনে ওই যে দেখছ বালির পাহাড়, ওসব কুয়ো খোঁড়া বালি। এসো, তুমিও আমাদের সঙ্গে হাত লাগাও।'

'আমার দাদা এই মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে, আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সে-কাজ ফেলে তোমাদের এই কাল্পনিক জলের খোঁজে আমি লাগব কী করে?'

'কাল্পনিক? তুমি রাক্ষসী পাখির কুয়োর কথা শোনোনি? সেই কোন প্রাচীনকাল থেকে মরুভূমির সবাইকে ঠান্ডা জল জোগাচ্ছে।'

'সেই মিঠে জল আমিও খেয়েছি।'

'কুয়োর কথা তুমি জানলে কী করে? সাদা চুলদাড়িতে মুখ-মাথা ঢাকা এক বৃদ্ধ কি তোমাকে সেখানে নিয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি জানলে কী করে? তুমি কি তাকে চেনো?'

'ভালো করেই চিনি। কিন্তু বিদেশিকে ওই কুয়োর সন্ধান দেওয়া নিষিদ্ধ জেনেও তিনি এ-কাজ কেন করলেন?'

'মরুঝড়ে পথ হারিয়ে মরতে বসেছিলাম, তখন তিনিই আমাকে উদ্ধার করেন।'

ছেলেটা এবার চাপা রাগের স্বরে বলল, 'তাহলে তো আর কথাই নেই। দয়ার অবতার, দয়ার মরূদ্যান! দয়া করবার জন্য সব সময় পা বাড়িয়ে আছেন!'

দয়ালু কারও কথা শুনলে কার না ভালো লাগে! আমিও তাই খুব উৎসাহ করে বললাম, 'চাঁদের তাঁবুতে যত গরিব লোক আসে সবাইকে দেখলাম তিনি চন্দ্রকান্তমণি বিলোচ্ছেন।'

'পাগল, পাগল। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ! তাঁবুর গায়ে চাঁদ এসে বসে আছে তোমাকে বলেননি? চাঁদের গা ঝাড়ার গল্প শোনাননি? গা ঝাড়া দিয়ে ঝুরিঝুরি চাঁদের কণা ফেলছে তাঁবুর মধ্যে-তোমাকে দেখাননি? ওই

তুমি যাকে চন্দ্রকান্তমণি বলে শুনেছ, দেখাননি?'

ওইরকম দয়াবান মানুষ সম্পর্কে এমন ব্যঙ্গবিদ্রূপ আমার ভালো লাগল না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ছেলেটা আবার মুখ খুলল, 'কত বেশি লোককে দয়া করা যায়, কার কত উপকার করা যায়-সব সময় এইসব ভাবতে ভাবতে মানুষটা এখন সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন। বালির বড়ো বড়ো দানা তাঁবুতে জড়ো করে ভাবেন চন্দ্রকান্তমণি! ওরকম বালি ওই অঞ্চলে এক-এক জায়গায় খুব দেখা যায়, জ্যোৎস্নায় চিকচিক করে। তার হারানো ছেলের কথা ভেবেই হয়তো তার এসব পাগলামি বেড়ে গেছে।'

আমি এতক্ষণে বলতে পারলাম, 'সেই ছেলের প্রিয় ঘোড়া যেখানে প্রভুর অপেক্ষায় অনাহারে আমৃত্যু দাঁড়িয়ে থাকত, ঠিক সেখানেই ঘোড়ার অবিকল একটা মূর্তি গড়ে রেখেছেন, ছেলে ফিরে এলে যাতে তার ঘোড়াকে দেখতে পায়।'

কথাটা শুনেই ছেলেটা দুয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে রইল, তারপর হঠাৎই আমাকে জড়িয়ে ধরে গলায় অদ্ভুত শব্দ করে কেঁদে উঠল।

অল্পক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তাঁবুর পিছনে বালির পাহাড়ের দিকে সে আমার হাত ধরে নিয়ে চলল। সবচেয়ে ডান দিকের ওই তাঁবুটাই সবচেয়ে বড়ো। তাঁবুর উত্তর-পশ্চিম দিকে কুড়ি-পঁচিশ হাতের মধ্যে কুয়োর জন্য গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। তিন মাসে নাকি ন-মানুষ সমান খোঁড়া হয়েছে, জল না ওঠা পর্যন্ত খুঁড়ে যাওয়া হবে।

এইসব বিবরণ শুনিয়ে ছেলেটা এবার আমার একটা হাত জোরে ঝাঁকিয়ে বলল, 'তুমি নদীর দেশের ছেলে, তুমিও হাত লাগাও!'

দাদাকে খোঁজার কথাটা আমাকে আবার বলতেই হল। শুনে ছেলেটা এবার আমার দু-হাত ধরে বিরাট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আমরাই তোমার দাদাকে খুঁজব। কীরকম গায়ের রং, চুল কোঁকড়ানো, না লম্বা, না খুলির ওপর বালির আস্তরণ, চোখ কটা না কালো, নাক টিকালো, না ভোঁতা, মাথায় লম্বা, না বেঁটে, না মাঝারি-সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলো।'

যা কিছু জানতে চাইল, তার বাইরেও দাদার চেহারার কয়েকটা চিহ্ন বর্ণনা করে বললাম, 'গত বেশ কিছু দিন ধরে আমি নানা দিকে গেছি, বেদুইনদের তাঁবুতে ঘুরেছি, কেউ যদি কোথাও দয়া করে আমার দাদাকে থাকতে দিয়ে থাকে!'

ছেলের দল মনে হয় নিজেদের মধ্যে আমার দাদাকে খোঁজার ব্যাপারেই আলোচনা করতে লাগল।

তার মধ্যেই মাঝের তাঁবু থেকে একটা মেয়ে পুরু মনসাপাতায় ঘন ক্ষীরের মতো বাটা তিলের মিঠাই এনে আমার সামনে ধরাল। সঙ্গে কুচকুচে কালো আস্ত একটা তরমুজ। তার গায়ে ছোট্ট একটা ফুটোর নীচে কোটের বোতামের মতো বড়ো আরেকটা ফুটো। মেয়েটা মুখে কিছু না বলে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল বড়ো ফুটোয় মুখ লাগিয়ে তরমুজ পান করতে হবে। ভেতরের সব শাঁস নাকি কী একটা কৌশলে ঘেঁটে রসে রূপান্তরিত করা হয়েছে। নির্দেশমতো তরমুজের ফুটোয় মুখ লাগিয়ে চুমুক দিচ্ছি, সর্দার ছেলেটা বলল, 'কুয়ো খোঁড়ার কাজ আরও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে দু-একদিনের মধ্যে তোমার দাদার খোঁজে বেরোব।'

সন্ধ্যে না নামা পর্যন্ত কুয়ো খোঁড়ার কাজ চলতে লাগল। তলার বালি কিছুটা দলাপাকানো ও আঁটোসাটো। হাতে নিয়ে দেখলাম বেশ ঠান্ডা।

সূর্যাস্ত এখানে অনেকক্ষণ ধরে হয়। তখন আকাশ ভরে মরুভূমি জুড়ে শুধু রঙের ঢেউ। সেই রঙে চান করে ফণিমনসার ঝোপ। অতীত যুগের মরা গাছের গুঁড়িতে শোকের ছায়া পড়ে। দূর দেশ থেকে এসে পাখির ঝাঁক আরেক দূর দেশের দিকে উড়ে যায়।

রাতে আমার শোবার ব্যবস্থা হল প্রথম তাঁবুতে, শুনলাম ছেলের দলের সর্দারও ওই তাঁবুতে থাকে।

আমার পাশের খাটিয়া থেকে যখন ছেলেটা এখানে জল পাওয়া গেলে সবুজ ঘাস আর রঙিন ফুলে জায়গাটা কীরকম সুন্দর করে তুলবে, তার বিস্তারিত বর্ণনা শোনাচ্ছে ঠিক তখনই তাঁবুর খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়ল আকাশ থেকে আতসবাজির মতো আগুনের গুঁড়ো ঝরে পড়ছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে এমন ঝাঁক ঝাঁক আগুনের ফুলকি ঝরতে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো কী?'

'তারার টুকরো খসে পড়ছে। মরা তারাও বলতে পারো। সেই দয়ালু বৃদ্ধ দেখলে বড়ো বড়ো মনসাপাতায় ওই আগুনের ফুলকি কুড়িয়ে নেবার জন্য দৌড়োদৌড়ি শুরু করতেন। এ নাকি আল্লার করুণার গুঁড়ো, গায়ে ছোঁয়ালে মানুষের রোগব্যাধি সেরে যায়। মানুষের কীসে উপকার সেটাই তো তাঁর সব সময়ের ভাবনা, তাই খুব সাধারণ জিনিসকেও খুব মূল্যবান ভাবেন, সেইমতো জুৎসই একটা গল্পও কল্পনা করে নেন।'

কথার শেষে তার বড়ো একটা দীর্ঘশ্বাস কেন পড়ল জানি না।

খাটিয়ায় শুয়ে শুয়েই কিছুটা দূরে একটামাত্র খেজুর গাছ দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ দেশে খেজুর গাছ থেকে রস হয় না? আমাদের বাংলায় শীতকালে খেজুর গাছের বুক ছুলে নিয়ে সেখানে কলসি ঝুলিয়ে রাখলে সারা রাত ধরে কলসিতে রস জমা হয়। সেই রস জ্বাল দিয়ে পাতলা মিষ্টি গুড়ও হয়।'

'জল পাই না, তার ওপর আবার রস! আমাদের জল চাই।'

'কুয়োয় জল পেতে আর কত দিন বালি খুঁড়বে?'

'যতদিন জল না দেখা যায়। একদিন এখানে জলও ছিল, জঙ্গলও ছিল, এখন সব মরে শুকিয়ে শুধু বালি। আমাদের দেশের যেখানে শেষ, অন্য দেশের শুরু, সেখানে এক পীর আছেন, তিনি বলেন, সারা পৃথিবীই একদিন মরুভূমি হয়ে যাবে।'

'আমাদের দেশে তা হবে না। সেখানে অসংখ্য নদী আর প্রচুর জঙ্গল।'

ছেলেটা এক ঝটকায় উঠে বসে বলল, 'ওই পীর কী বলেন জানো? বলেন, মানুষই একদিন সব জল জঙ্গল খেয়ে ফেলবে। শোনা যায়, পীর নাকি একবার তোমাদের দেশেও গিয়েছিলেন।'

'আমাদের বাংলায়ও গিয়েছিলেন? সেখানে প্রচুর আম জাম জামরুলের বাগান। বাড়ির উঠোনে কাঁঠাল গাছ। বট অশত্থ নিম তেঁতুল গাছ তো সব জায়গায়। নদী-নালা খাল-বিলও অগুনতি। বড়োদের কাছে শুনেছি এতরকম ফল আর এতরকম জল পৃথিবীর আর কোথাও নেই!'

'পীর তোমাদের দেশের কোন দিকে কোথায় গিয়েছিলেন জানি না। তবে পীরের একটা কথা খুব ছোটোবেলায় আমি সেই চাঁদের তাঁবুর মালিকের মুখে শুনতাম। কথাটা হল, বড়োরা যদি মনের গভীরে পীর বা ফকির না হয় তাহলে তারা মানুষের কোনো কাজে লাগে না। আমাদের দেশের বড়ো মানুষদের প্রায় কেউই মনে মনে পীরও না, ফকিরও না, আমাদের দুঃখেরও তাই শেষ নেই।'

৭

অনেকক্ষণ ধরে জল বয়ে যাবার ছলছল শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎই জোর ছলাচ্ছল শব্দ শুনে চমকে গেলাম। শেষ পর্যন্ত তাহলে এখানে জল পাওয়া গেছে! আনন্দে খাটিয়া থেকে নেমে তাঁবুর বাইরে এসে দেখি-কোথায় জল! যেখানে কুয়ো খোঁড়া হচ্ছিল, সেখানেও শুধু বালির পৃথিবী। স্বপ্নে জলের শব্দ শুনে মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল! সত্যি, মানুষ ইচ্ছে মতন ভালো ভালো স্বপ্ন দেখার উপায় বের করতে পারলে, জীবন কত আনন্দের হত!

তাঁবুর বাইরে শীত বেশ। ভালো করে আলোও ফোটেনি। ভেতরে এসে প্রথমেই চোখে পড়ল, আমার পাশের খাটিয়া শূন্য। ছেলেটা কখন উঠে চলে গেছে, ঘুমের মধ্যে জানতেই পারিনি।

তখনই আবার তাঁবুর বাইরে এলাম। অন্য দুটো তাঁবুর মানুষজন যে-যার দিনের কাজে লেগে পড়েছে। একটা মেয়ে ছাগলের দুধ দুইতে দুইতে ছাগলটার সঙ্গে অনর্গল কথা বলে চলেছে। তাঁবুর পুব দিকে তিনটে উট কাঁটাঝোপ মুখ দিয়ে ছিঁড়ে একভাবে চিবোচ্ছে। দূর থেকে একজনকে এই তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মনে হল ছেলেটা নিশ্চয়ই ফিরে আসছে।

চোখ সরু করে সেদিকে চেয়ে আছি, হঠাৎ আরও কাছে এসে ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল, 'ছোটু! পমপম! তুই বেঁচে আছিস?'

এ তো দাদা! আমার পুরো নাম অনুপম কখনো বলে না। ডাকে পমপম বলে। আদর করে 'ছোটু'ও বলে। আমাকে দেখতে পেয়ে দাদা তো দৌড়োচ্ছেই, আমিও দৌড়ে গিয়ে দাদার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

আমি যে এখানে আছি দাদা জানল কী করে?

দাদার উত্তর, 'আমি জানব কেন, একটা ছেলেই তো আমাকে এদিকে নিয়ে এসে এই তাঁবুর পথ বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। বলল, সোজা গিয়ে মাঝের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে ভাইয়ের নাম ধরে ডাকতে হবে। বলেই আরেক দিকে হনহন করে সে চলে গেল।'

আমি কী করে বেঁচে আছি, এই অসীম মরুভূমিতে আশ্রয় পেলাম কী করে, শোনবার জন্য দাদার আর তর সয় না। দাদাকে নিয়ে আমারও মনের অবস্থা একই। শেষে দাদাই বলল, 'আমি দস্যুদের হাতে ধরা

পড়েছিলাম। এই ছেলেটা কী করে আমাকে আজ উদ্ধার করল সেও এক রহস্য। শেষ পর্যন্ত আমরা যে নিজেদের ফিরে পেয়েছি সেটাই জগতের নবম আশ্চর্য! এ নিয়ে সারা বছর ধরে আমাদের কথা হবে। এখন সবচেয়ে আগে দরকার দেশে ফেরার একটা উপায় বের করা। সেই ছেলেটাই হয়তো সাহায্য করতে পারত, কিন্তু ওর নিজেরই খুব বিপদ মনে হল। উটের পিঠে একটা লোক এসে ছেলেটাকে কী যে একটা বলে গেল, ছেলেটাও আমাকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এদিকে এসে তাঁবুর পথ দেখিয়েই উলটো দিকে দৌড় লাগাল।'

সকাল থেকে আবার কুয়োর জন্য খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়েছে। আমি দাদাকে বললাম, 'এরা আমাদের জন্য কী না করেছে! দলের সর্দার ছেলেটা না থাকলে আমিও এখানে এমন আশ্রয় পেতাম না, তোমাকেও এভাবে ফিরে পেতাম না। চলো, ওদের সঙ্গে আমরাও হাত লাগাই। ওরা বালি খুঁড়ে জল বের করতে চায়।'

'মরুভূমিতে কুয়ো? সে কি সম্ভব?'

'কেন, আমরা তো দুবাইয়ে আছি। এখানকার মরুভূমি তো পারস্য উপসাগরের কাছেই।'

দাদা আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'দুবাইয়ে নেমেছি বলে আমরা কি এখনও সেখানেই আছি? অনেক অনেক দূরে অসীম মরুভূমির গভীরে আমরা চলে এসেছি। দুবাই যে-দেশের রাজধানী সেই আরব আমিরশাহী থেকেও অনেক দূরে অন্য কোনো মরুভূমিও হতে পারে এটা। দস্যুরা তো আমাকে প্রথমে উটের পিঠে চড়িয়েই দিনের পর দিন ঘুরিয়েছে। প্রথম যে আস্তানায় আমাকে এনে রাখল সেটাই সাতাশ দিনের রাস্তা, যেতে যেতে আমি এক-একটা দিন গুনতাম আর মুখস্থ করে রাখতাম। যদি কখনো কোনো রক্ষীবাহিনী আসে আমাকে উদ্ধার করতে, তখন ওই দিনের হিসেবটা দূরত্ব বোঝাতে কাজে লাগবে।'

দাদার কথা শুধু ওইটুকু শুনেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আমার সবটাই পায়ে হেঁটে। তবে তুমি যেমন দস্যুর হাতে পড়েছিলে, আমাকে তেমনই উদ্ধার করেছে এমন একজন যাকে তুমি পীর বা ফকির বা দেবতাও বলতে পারো।'

'তাঁকে আর পাওয়া যায় না?'

'শুধু পূর্ণিমায় তাঁকে পাওয়া যায়। পূর্ণিমার দু-দিন আগে আর দু-দিন পরেও তাঁকে চাঁদের তাঁবুতে পেতে পারি।'

'চাঁদের তাঁবু? মানে?'

'তিনি বলেন, পূর্ণিমায় চাঁদ সারা রাত আকাশ পরিক্রমা করে ওই তাঁবুতে এসে জিরিয়ে নেয়।'

'দূর! তা আবার হয় নাকি?' দাদা এক কথায় উড়িয়ে দিল।

আমি মনের দুঃখ সয়েও বললাম, 'দাদা, তুমিও এবার বড়োদের মতো কাউকে না জেনে না বুঝে চট করে তার বিচার করে ফেলছ!'

'তাই বলে উদ্ভট আজগুবি অদ্ভুতুড়ে গালগল্পও বিশ্বাস করতে হবে? তার চেয়ে চল, বরং ওদের কুয়ো-কুয়ো খেলায় আমরাও ঢুকে পড়ি।'

দাদার কি আর আমেরিকা যাওয়া হবে? সেখানে আমার স্কুলে ভরতি হবারই বা কী হবে? কুয়োর দিকে যেতে যেতে কথাটা তুলতে দাদার চটপট উত্তর, 'তোকে ফিরে পেলাম, এর পর ওসব আর কে ভাবছে! তা ছাড়া এ বছরের তো সেমেস্টার শুরু হয়ে গেছে। আবার সামনের বছর দেখা যাবে।'

সন্ধ্যে পর্যন্ত কুয়োর কাজ চলল। গোড়ায় আমাদের অসুবিধে হলেও অল্প সময়েই স্তূপের মতো বালি সাজিয়ে রাখার দক্ষতা এসে গেল। বালির পাহাড়ের নীচেই এরকম বেশ কয়েকটা বালির স্তূপে বিকেলের নরম রোদ পড়ে অনেকরকম ছবি ফুটে উঠছে। সেইসব ছবি দেখে বালি বয়ে আনার কাজটা আমার ভালো লাগতে লাগল। একসময় দেখলাম মরুভূমিতে বালির ঢেউয়ে লেগে থাকা গোধূলিবেলার আলো মুছতে মুছতে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

সারাদিন এই বালির জগতে, বালি খোঁড়ার কাজে আমাদের দিন কাটে। আকাশ রাঙিয়ে সূর্য ওঠে, মরুবালু জ্বালিয়ে সূর্য মাথার ওপর চড়ে, মরুভূমিতে রং ঢেলে সূর্য ডোবে। দাদা আর আমি তাঁবুতে শুয়ে মরুভূমি থেকে বেরোবার উপায় খুঁজতে থাকি।

একদিন ভোর না হতেই দু-জনে খাটিয়ায় উঠে বসে দিকচিহ্নহীন মরুভূমি পার হবার পথ নিয়ে কথা বলছি, তাঁবুর দরজা দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, দাদা কথা থামিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, 'কে একজন এদিকেই আসছে না?'

দু-জনে একই চাদর জড়িয়ে তাঁবুর বাইরে এসে দূরের আগন্তুককে লক্ষ করতে লাগলাম। খানিকটা কাছে আসতে দাদা বলে উঠল, 'আরে! ও-ই তো আমাকে এই তাঁবুর পথ বাতলে দিয়েছিল। ঠিক এগারো দিন পর আবার এখানেই আসছে।'

আমিও চিনেছি। এ-ই নিজের তাঁবুতে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিল। এখানকার ছেলেদের সর্দার। দাদার চাদর থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমি দৌড়ে গিয়ে ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরলাম। দুয়েক মুহূর্ত পরই বুঝলাম কান্না চাপবার চেষ্টা করতে গিয়ে সে ফোঁপাচ্ছে। হঠাৎ হু-হু কান্নার মধ্যে সে বলল, 'আব্বাকে বালির নীচে শুইয়ে এলাম।'

'সে কী! বালির নীচে কেন?'

বুক ভাঙা কান্নার মধ্যে শোনা গেল-'কবর দিয়ে এলাম। সেই ঘোড়ার মূর্তির পাশেই। কাল পূর্ণিমায় কবরের বালির ওপর জ্যোৎস্নাও বোধ হয় কান্নায় লুটোপুটি খেয়েছে!'

দাদা আমার পাশে এসে আমার মতোই কথা হারিয়ে ফেলেছে। দু-জনে দু-কারণে নির্বাক। তার আব্বা কে বুঝে, আমি আমার চেয়ে বয়েসে বড়ো ছেলেটার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কোনোরকমে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছিল?'

'অসময়ে ভিস্তি ভরে জল আনতে গিয়ে রাক্ষসী পাখির সঙ্গে লড়াই করে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল।'

তাঁবুর দিকে এগোতে এগোতে চোখ মুছে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে ছেলেটা আবার বলল, 'চলো, এই কুয়ো আমরা সবাই মিলে খুঁড়বই। আমার সামনে এখন অনেক কাজ।'

দাদা এতক্ষণে শুধু বলতে পারল, 'তোমার কাছে আমাদের দু-ভাইয়ের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। যতক্ষণ পারি কুয়ো খোঁড়ার কাজে আমরাও হাত লাগাব। তারপর তুমি আমাদের মরুভূমি থেকে বেরোবার উপায় বের করে দিয়ো ভাই!'

'তা তো করবই। তার আগে, অনেক দূরে পাহাড়ের মাথায় একটা হ্রদের কথা আব্বা বলে গেছে, শীতকালে জমে বরফ হয়ে থাকে, সেই হ্রদ থেকে মরুভূমিতে জল আনা যায় কি না দেখতে হবে।'

দূরে মিলিয়ে যাবার আগে যতক্ষণ তাকে দেখা গেল, ততক্ষণ দাদা সেদিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'পাহাড়ের মাথায় হ্রদ! সেখান থেকে খাল কাটার স্বপ্ন দেখছে? এ তো বদ্ধ পাগল রে, পমপম! আমাদের কি তাহলে এই মরুভূমিতেই জীবন কাটবে?'

আমি আর বললাম না যে ওর বাবাও এরকম ছিল। তার তাঁবুতে চাঁদ জিরোতে আসত। গা ঝাড়া দিয়ে তাঁবু ভরে চন্দ্রকান্তমণি ঝরাত। শুধু বললাম, 'মনে হয় ও ফিরে এসে আমাদের ফেরার উপায় করে দেবে।'

সেদিন থেকেই দাদার আবার দিন গোনা শুরু হল।

আমি আর কী করি! সারা দিন বালি বয়ে বয়ে একজায়গায় জড়ো করি, যেন বালির পাহাড় বানাচ্ছি আর দিনের শেষে তাঁবুতে বসে ছবি আঁকি। মরুভূমিতে যা-যা দেখেছি তার মধ্যে যেগুলো কোনোদিন ভুলব না সেগুলো আঁকবার চেষ্টা করি। শেয়ালকাঁটা আর ফণিমনসার ফুল ঘষে রং বের করে তা দিয়ে যতটুকু যা পারি আঁকি। মরূদ্যানের ঘাস-ফুলের গ্রামে গিয়ে ফুল এনে তা থেকে রং বানাই। মরা মনসার গোড়া পুড়িয়ে কালো রংও আমি তৈরি করতে শিখেছি।

এদের খাবারও আর আমাদের কাছে আগের মতো খারাপ লাগে না। দাদা আমি দু-জনেই মোট মোটা বজরার রুটি মিষ্টি খরমুজের রসে ভিজিয়ে দিব্যি খেয়ে নিই। ফণিমনসার পাতার তরকারি জিভে একটু হড়হড়ে লাগলেও খেয়ে ফেলি। তা ছাড়া মাঝে মাঝে প্রচুর বেদানার দানা মেশানো মুরগি বা কী-একটা পাখির ঝোল বা আর-কিছুর মাংসের কোর্মাও আজকাল অভ্যেস হয়ে গেছে।

রাতে পাশাপাশি দুটো খাটিয়ায় শুয়ে মরুভূমিতে দস্যুদের হাতে বন্দি দাদার দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার গল্প শুনি। দাদা এমনভাবে বলে যায় যেন বই থেকে কারও অভিযান-কাহিনি পড়ে শোনাচ্ছে। বালির নীচে সুড়ঙ্গের কথা কখনো কোথাও শুনিনি, কিন্তু দাদার ধারণা তাকে নাকি দস্যুরা বালির অনেক নীচে খুব লম্বা একটা সুড়ঙ্গে অনেকদিন আটকে রেখেছিল। খুব ঠান্ডা সেখানে। মরুভূমির ওপরে দুপুরের তাতে যখন গা পুড়ে যায়, নীচের সুড়ঙ্গে তখন নাকি মেদিনীপুরের মাঘের শীত।

একদিন এরকম দাদার গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি, কে একজন তাঁবুতে ঢুকে চুপিচুপি আমার ঘুম ভাঙাল। হাতের ইশারায় আমাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বলল, 'এখান থেকে সোজা সামনের দিকে হেঁটে যাবে। দু-বার সূর্যাস্ত না দেখা অবধি সোজাসুজি এগোতে থাকবে। পর দিন কাছে বা দূরে সূর্যোদয়ের সময় একজায়গায় খুব পুরোনো একটা দুর্গ দেখতে পাবে। পাথরে তৈরি প্রাচীনকালের সেই দুর্গের মাথার দিকটা শুধু বালির ওপর জেগে আছে। সেদিকেই মরুভূমি থেকে তোমাদের বেরোবার পথ।'

আমি উত্তেজনা চেপে বললাম, 'দাঁড়াও, দাদাকে ডেকে আনি।'

'না। আমার বন্ধু বলে দিয়েছে তোমার দাদার বিরাট কিছুতেই বিশ্বাস নেই। অসম্ভবকেও যে সম্ভব করা যায় সে তা বিশ্বাসই করে না। পথের কথাও তাই শুধু তোমাকেই বলতে বলেছে।'

'তোমার বন্ধু এখন কোথায়?'

'পাহাড়ের মাথায় হ্রদের খোঁজে গেছে। ফিরতে যদি খুব দেরি হয়ে যায় তাই পথের কথা তোমাকে জানাবার জন্য আমাকে পাঠাল।'

ছোটোবেলায় বাজ পড়ার শব্দে যেমন আমার বুক খালি হয়ে যেত, ছেলেটার কথা শুনে ঠিক তেমনই বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। কোনোরকমে বললাম, 'তার সঙ্গে আর কি আমার দেখা হবে না?'

দেখা হবে, না কি হবে না-ঠিক কী বলে সে চলে গেল, অন্ধকার দমকা হাওয়ায় সেকথা শোনা গেল না।

৯

তাঁবুতে এসেও শেষ রাতটুকু আর ঘুমোতে পারলাম না। দাদাকে জাগিয়ে রাতের ঘটনাটা বললাম। পাছে আমি ভুলে যাই, তাই মরুভূমি থেকে বেরোবার পথ আমাকে যেমন বোঝানো হয়েছিল হুবহু সেটাই দাদাকে বোঝালাম।

দাদা লাফিয়ে উঠে প্রথমেই খাটিয়ার তলা থেকে আমাদের দু-জনের জুতো বের করে আমার জুতো জোড়া আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে নিজেরটার বালি পরিষ্কার করতে লেগে গেল। জুতোর বাইরে-ভেতরে বালি সেঁটে আছে। প্রত্যেকটা খাঁজে, সেলাইয়ের ভাঁজে বালি। হাঁটতে গেলে পা ছড়ে কেটে জ্বালা করে, দু-পায়েই ফোসকা পড়ে এমন দশা হয়েছে যে, এই তাঁবুতে আশ্রয় পেয়েই আমরা জুতো তুলে রেখেছিলাম।

এখানকার প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রথমেই আমরা গেলাম ফুলে রাঙা মরূদ্যানের সেই গ্রামে। দাদাকে তারা আগে দেখেনি, কিন্তু আমার মুখ দেখেই হয়তো বুঝেছে যে আমরা মরুভূমি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। বড়ো মোটা মনসাপাতায় তিলবাটার মিঠাই আমাদের দু-ভাইকেই খেতে দিল।

যে বউটি তার কোলের ছেলের জন্য আমার আংটি চেয়ে নিয়েছিল, সেও আমাদের খবর পেয়ে তার বাচ্চাকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে দেখেই আনন্দে মুখ ভরে হাসল। কুয়োর জল নেবার জন্য আমরা একটা ভিস্তি চাইতেই তার মুখের ভাব বদলে গেল, চোখ ক্রমশ জলে ঝাপসা হয়ে এল, বাচ্চাটাকে বুকে চেপে ধরে সে অদ্ভুত শব্দে কেঁদে উঠল। যে জল তুলে ভিস্তিতে ভরে দিচ্ছে সেও মাঝে মাঝে তার সাদা পোশাকের কোণ তুলে ধরে চোখ মুছছে দেখে আমারও চোখ ভিজে উঠল। এদের কাছ থেকে এভাবেই বিদায় নিতে হল।

জলভরা ভিস্তির ওজন খুব কম নয়। ঠিক হল আমরা দু-জনে ভাগাভাগি করে বইব।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম হাওয়াও বাড়তে লাগল। হঠাৎ হঠাৎ হাওয়ার তোড়ে একজায়গার বালি আরেক জায়গায় টিলা বানাচ্ছে। দূর থেকে মনে হয় বিরাট বিরাট ঢেউ জমে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে একজায়গায় দাদা বালির ওপর বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'সূর্য কতবার উঠল আর কতবার ডুবল বলতে পারিস?'

আমিও বসে পড়েই বললাম, 'সে কী! আমি তো গুনিনি। তুমি তো সব সময় সব কিছুই গুণে রাখো।'

এতক্ষণেও বালির মধ্যে মাথা তুলে রাখা প্রাচীন দুর্গ দেখতে না পেয়ে দু-জনের মনেই খুব উদ্বেগ। চারদিকে বড়ো বড়ো বালির ঢেউ দেখে ভয় হল, সেই পোড়োবাড়ি বালিতে ঢাকা পড়ে যায়নি তো!

শুধু হেঁটে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর উপায়ও নেই। মরি-বাঁচি, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে তো হবেই।

একদিন সূর্যাস্তের বেশ কয়েক ঘণ্টা পর দূর থেকে আকাশে রঙের হিল্লোল দেখতে পেয়ে নতুন করে আশায় আমাদের মন চাঙা হয়ে উঠল। সামনেই বালির ঢেউ ভেঙে মাথা তুলে আছে পাথরের দুর্গচূড়া।

শেষ পর্যন্ত ছেলেটার কথা এভাবে মিলে গেল দেখে সাহসে ভর করে এবার আমরা ডান দিকের পথ ধরলাম। এই পথের শেষেই আমাদের দেশের পথ। দেশে ফেরার নিশ্চয়তা পেয়েও কেন আমার মন হ্রদের খোঁজে চলে যাওয়া ছেলেটার জন্য টনটন করে উঠল কে জানে।

হঠাৎ মনে পড়ল ছেলেটার নামই আমার জানা হয়নি।